চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর

নাটকে চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন, "নাট্যকার নাটক রচনা করবার সময় জীবন-সত্যের একটি বিশেষ দিক রূপায়িত করবার সংকল্প নিয়েই বসেন। নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডির মধ্যে কয়েকটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই জীবন-সত্যকে নাট্যরসোত্তীর্ণ করে তোলাই হল তাঁর উদ্দেশ্য। এজন্য ঘটনা-সংস্থাপনার কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলির নাটকীয় উপযোগীতার দিকেও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। সক্রিয়তা, আবেগধর্মীতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি গুণগুলি নাট্যচরিত্রের মধ্যে দেখাতে পারলে সেই চরিত্রও সংবেদনশীল হতে পারে।"[১] অর্থাৎ নাটক কিংবা লোকনাটক যাই হোক না কেন, কাহিনির মতো চরিত্রের সমৃদ্ধ কলা-কৌশল, অভিনয়, সাজসজ্জা ও বাচনভঙ্গিতে কাহিনির বিভিন্ন খণ্ডিত অংশগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কাহিনির মতো চরিত্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ নাটক বা লোকনাটকের জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে চরিত্রের উপর। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে কাহিনির পাশাপাশি চরিত্রগত রূপান্তর ঘটে চলেছে। চরিত্রের এই রূপান্তর সাধারণত তিন দিক থেকে হয়ে থাকে। যথা— i) নতুন নতুন চরিত্রের আগমন, ii) স্ত্রী চরিত্রে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তি এবং iii) পুরনো চরিত্রগুলির নব রূপায়ণ।

লোকনাটকগুলির পরিবেশনগত দিক থেকে নতুন নতুন চরিত্রের আগমন সব দিক থেকে বিশেষত্বের দাবী রাখে। পূর্বে মূল যিনি গায়ক বা গীদাল ও তার সহকারী অভিনেতা দোহার বা দোয়ারী চরিত্র দুটি এবং কিছু বাদ্যযন্ত্রী মিলেই লোকনাটক উপস্থাপন করত। গীদাল নিজে কখনও প্রধান চরিত্রে, কখনও বা সূত্রধরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। অভিনয়কালে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন দোয়ারী। সে তাঁর পরনের ধুতিটাকে গলায় পেচিয়ে সেজে উঠত নারী। কিন্তু এখন দেখা যায় সময়ের সাথে সাথে লোকনাটকে চরিত্রের আনাগোনা বেড়েছে, ফলে অনেকগুলি চরিত্র একসঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, " 'মাস্টার', 'ছোকরা', 'ছড়াদার', 'গীদাল', 'দোয়ারি', 'জোকার' বিভিন্ন চরিত্রের অভিনেতা, এবং বাদ্য শিল্পীদের নিয়েই লোকনাট্যের শিল্পী-পরিবার। 'মাস্টার' সাধারণতঃ দলের চালক হয়ে থাকেন। 'ছোকরারা' নৃত্য গীত পরিবেশন করেন, 'ছড়াদার-রা' টিপ্পনি ও ছড়া কাটেন, কথার হুল ফোটান, কখন কখন চরিত্র ভূমিকায় আসেন, 'গীদাল' মূল কাহিনীটিকে ধরে রাখেন, 'দোয়ারি' বা 'জোকার' হাসিঠাট্টার ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভূমিকা পালন করেন, বিভিন্ন চরিত্র, চরিত্র অনুসারে অবতীর্ণ হন।"[২] অন্যভাবে বলা যায় গীদাল ও দোয়ারীর উপর পালার অনেকাংশই নির্ভর করত, কিন্তু এখন তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা চলে এসেছে। বর্তমানে দোয়ারীর কাজ কেবল মূলের কথার ভাংতি দেওয়া এবং হাস্যরসের অবতারনা করা। যেমন -'কুশান' লোকনাটকে গীদাল নিজেই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতেন। পরের দিকে বিভিন্ন চরিত্রের বাদ্যযন্ত্রী, ছুকরী প্রমুখেরা অংশগ্রহণ করে।

আবার গম্ভীরার ক্ষেত্রে দেখি গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হত শিবের থানের সামনে। যেহেতু শিবের অপন নাম গম্ভীর, তাই যেখানে শিব ঠাকুর পূজা করা হয়, সেই স্থানটিকে গম্ভীরা বলা হয়। অর্থাৎ শিব মন্দিরটিকেও গম্ভীরা বলা হয়। সেই মন্দির বা থানে শিব-মূর্তির সামনে মানুষ তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য প্রার্থনা জানাত। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা কালে ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পালাকারেরা যখন সোচ্চার হলেন, তখন থেকেই পালাধর্মী ফর্ম তৈরি হয়েছিল গম্ভীরায়। সেই সময় থেকে এগিয়ে দেখা যায় এই শিব একসময় প্রতীকে পরিণত হল। রক্ষাকর্তা শিব পরিবর্তিত হল শাসকদলের প্রতিভূ হিসেবে। পালাকারেরা তাদের অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে সমস্ত অভাব-অভিযোগ তুলে ধরল এবং এসবের জন্য শিবকেই দায়ী করতে লাগল। এখানেই এই শিব চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। পরবর্তীকালে আমরা দেখি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে শিবের আসরে আগমণ। সমস্ত অভাব-অভিযোগ শুনে তিনি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্তর্হিত হন। পুষ্পজিৎ রায়ের মতে, "পালারূপে 'বন্দনা' পর্যায়ে শিব হচ্ছেন প্রধান চরিত্র। গম্ভীরায় আপন 'থানে' আসীন থাকতেন শিব (মূর্তি)। তাঁকে লক্ষ করেই সব গান সব কথা নিবেদন করা হত—

শিবো হে
বুঝি বাঁচে না জান,
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
নষ্ট করল্যা মাটি হে .... ইত্যাদি।

কিন্তু আধুনিক কালের শিব একটি চরিত্র হিসেবেই আসরে প্রবেশ করেন। চরিত্র হিসেবে শিবের এই ভূমিকাটি ঠিক কতদিন থেকে প্রচলিত তা সঠিক ভাবে বলা যায় না।"[৩] অনুমান করা হয় ১৯৩৫ - ১৯৩৮ খ্রীঃ মধ্যে গম্ভীরায় শিব চরিত্রের উপস্থাপন করেছেন মোহম্মদ সুফী। প্রচলিত কাহিনিটিকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, এই শিব চরিত্রের অন্তর্ভূক্তি বেশিদিনের নয়। এছাড়া গম্ভীরার চারইয়ারী পর্যায়ে চারজনের মধ্যে একজন উচিত বক্তা থাকেন। এই 'উচিত বক্তা' চরিত্রটিও বেশি পুরনো নয়।[৪]

'নটুয়া' লোকনাটকে গীদাল নিজেই রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কখনও রাধা, আবার কখনও সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। দোয়ারী বা বতেয়া উধব-মাধবের চরিত্রে অভিনয় করতেন। কিন্তু এখন দলের মধ্যে থেকেই একজন ছুকরীকে রাধা সজানো হয়। আর বাকী ছুকরীরা রাধার সখী হিসেবে অবতীর্ণ হন। যদিও রাধার নিজের মুখে কোন সংলাপ থাকে না।

'খন' ও 'পালাটিয়া'র ক্ষেত্রেও দেখি ওসিয়া বা বতেয়া এবং মূল মিলে পালাটি পরিবেশন করতেন। তবে নারীবেশী 'ছুকরী'রা নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি এখন বিভিন্ন চরিত্রেও অভিনয় করে থাকেন। জনৈক সমালোচকের মতে, এই ছুকরী বা ছোকরার সংখ্যা এক একটি পালাগানে ৩-৪ জন। খন গানের পালায় এঁরা কখনও নায়িকার ভূমিকায়, আবার কখনও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন।[৫] আবার জোতদার বা

মহাজন চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য দল থেকে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত লোকনাটকগুলিতে পুরুষেরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে এসেছে। সবক্ষেত্রেই তারা নারী চরিত্রের অভিনয় করে পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছে। গ্রামীণ দর্শকদের চমকৃত করেছে। লোকনাটকগুলিতে নারীবেশে ছেলেদের ছুকরীতে রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে শিশির মজুমদার বলেছেন, "বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় নামে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনাট্যে এদের সন্ধান মিলবে। এরা আসলে পুরুষ। প্রধানত তরুণ বয়সী। ছোকরা বা ছুকরী নাচার জন্য তারা মাথায় স্বাভাবিক লম্বা লম্বা চুল রাখে। তবে পরচুলাও তাদের পরতে হয়। ...এরা যেভাবে শাড়ি পরে তা আধুনিক নারীর মতো।"[৬] এক্ষেত্রে দর্শকমনে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগতে পারে, এ ধরণের নাটকে যখন কোন পুরুষ নারী চরিত্রে অভিনয় করে, তখন সেখানে উপবিষ্ট দর্শক ও শ্রোতা সকলেই জানে যে সে প্রকৃতপক্ষে মেয়েই নয়; তবে সেক্ষেত্রে নর-নারীর আবেগঘন ও স্পর্শকাতর অভিনয় কি করে দর্শকদের হৃদয়াঙ্গম হয়! অথচ আশ্চর্যের বিষয় দর্শকসাধারণের মনে এ ধরণের কোন প্রশ্ন জাগে না, উল্টে এটাতেই তারা বেশি আনন্দ পায়। তবে নারী চরিত্রে পুরুষের এই অভিনয়ের পেছনে কতগুলি কারণ বর্তমান। কারণ হিসেবে বলা যায়, কিছুকাল আগে পর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্যে অভিনয় ছিল নিষিদ্ধ। তখনকার সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী নারীদের এই সুযোগ দেওয়া হত না। তাই মেয়েদের অভাবে ছেলেরাই মেয়ে সাজত। এদিকে গ্রামীণ দর্শক সমাজ পালাগানের মধ্যে এতটাই একাত্ম হয়ে যেতেন, কে পুরুষ বা কে মহিলা— সে বিষয়ে তারা মাথা ঘামাতেন না। আর তাই ছুকরী ও নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এমন ছেলেকেই নির্বাচন করা হত, যার বয়স অল্প, মেয়েলি মুখাবয়ব, মেয়েলি কণ্ঠ এবং নাচ-গানে কিছুটা পারঙ্গম। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে কয়েক বছর ধরে গীদাল বা দলের পরিচালকরা নিজেদের ঘরের মেয়েদের দলে নামানোর পর থেকে দরিদ্র ঘরের মেয়েরা অর্থ উপার্জনের আশায় নিজেরাই এগিয়ে এসেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য, ততদিনে সামাজিক অনুশাসন অনেক শিথিল হয়েছে। কেবল ছুকরীই নয়, বিভিন্ন চরিত্রে তাদের অভিনয় করতে দেখা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলারা মূলের ভূমিকায়ও অভিনয় করে— এমন নজির অনেক পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলা যায়, সমাজজীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি দর্শক ও শ্রোতার রুচির পরিবর্তন হয়েছে। থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির প্রভাবে তারা এখন আর নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় দেখতে চায় না। ফলে লোকনাটকের চাহিদা হ্রাসের ভয়ে শিল্পীরা সম্প্রতি স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মেয়েদের নিয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, এখনকার দিনের সিনেমা, যাত্রা প্রভৃতি বিনোদনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার জন্য শিল্পীরা লোকনাটকে এই পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়, "আগে ছেলেরা মেয়েদের অংশে অভিনয় করত, কিন্তু সাম্প্রতিককালে ব্যবসায়ী আলকাপের দলে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য মেয়েদেরও নিযুক্ত করা হয়।"[৭] তবে শুধু আলকাপ নয়,

বর্তমানে প্রায় সব লোকনাটকেই মেয়েদের নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই 'ব্যবসায়ী' শব্দটি। সত্যি কথা বলতে কি, এখন সমস্ত বিনোদনের মাধ্যম ব্যবসার উপাদনে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। কেবল প্রয়োজনের তাগিদে এগুলিকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। ব্যবসার তাগিদে এর মধ্যে কৃত্রিমতার বেনোজল ঢুকে পড়েছে।

আর একটি পদ্ধতিতে লোকনাটকে চরিত্রের রূপান্তর ঘটে থাকে, তা হল পুরনো চরিত্রগুলির নব রূপায়ণ। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও সমাজের শোষক-শোষিতের চরিত্র ঠিক একই রকমের রয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে শোষিতরা শোষকের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে চলেছে। শোষক-শোষিতের সম্পর্ক না বদলালেও প্রতিনিয়ত শোষকের রূপ বদলাতে থাকে। সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিদার, জোতদারেরা ছিল শাসনতন্ত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। খন ও পালাটিয়া লোকনাটকে সেই সময় সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ হিসেবে জমিদার, জোতদার প্রমুখেরা স্থান পেয়েছিল। জমিদারী প্রথা বিলোপের সাথে সাথে আর এক শ্রেণীর শাসকের উদ্ভব হয়, যার নাম মহাজন। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি যেহেতু কৃষিনির্ভর, কৃষকদের উপর চলতে থাকে অবাধ শোষণ। মহাজনের শোষণের পাশাপাশি রয়েছে বড় বড় আড়তদার, ফড়ে প্রভৃতির দৌরাত্ম্য। এই চরিত্রগুলিই সমসাময়িক লোকনাট্যগুলিতে উঠে এসেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও লক্ষ করা যায় উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলিতে। যেমন, গম্ভীরা পালায় শিবের সামনে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভাব-অভিযোগ পেশ করার রীতি বহুকালের। স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল গম্ভীরার সাহায্যে। স্বাধীনতার পর সেই শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তিত রূপ নেতা-মন্ত্রীরা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গম্ভীরা পালার কথা। তৎকালীন সময়ে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইংরেজ। এখানে ইংরেজদের দ্বারা শোষিত পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি অন্যায়-অবিচারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে —

"চিরকাল দুঃখে কষ্টে দেহ জর্জরিত
পরাধীন ভারতবাসী মোরা হায় কেঁদেছি নিয়ত
অবিচারের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছি কত কষ্টে
(সাহেব) তার ফল কি তোরা ভোগ করবি না!"

সহস্র রক্তক্ষয়ে যে স্বাধীনতা এসেছিল সেই স্বাধীনতা কি মানুষ চেয়েছিল? ইংরেজরা ভারত ছাড়ার পর শাসনযন্ত্রের নিয়ামক হয়ে ওঠেন নেতা-মন্ত্রীরা। বর্তমানে নেতা-মন্ত্রীরাই দেশের সর্বেসর্বা। নেতা-মন্ত্রীদের অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ, প্রশাসন, আমলা সমস্ত কিছুই চলছে। তাই তো—

"গণতন্ত্র নয় দলতন্ত্র চলছে এই ভারতে
খুনী গুণ্ডা লম্পট চিটার ঢুকছে সব দলেতে

দাদাদের মদতের জোরে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ঘুরে
দলের নির্বাচনের তরী বাহিতে এরাই যে কাণ্ডারী
ব্যস্ত বিলাস ব্যসনে প্রমোদ ভ্রমণে ভারতের মন্ত্রী প্রবর।"

শুধু তাই নয় বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন, নারীরক্ষা সমিতি; আমলাতন্ত্র, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা প্রমুখ চরিত্রগুলির মধ্যেকার স্বার্থবাদী রূপটি গম্ভীরায় প্রকাশ পেয়েছে।

আবার নটুয়া ও কুশানের মত লোকনাটকগুলিতে পৌরাণিক চরিত্রগুলি কখন যেন আমাদের ঘরের মানুষের পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানস মজুমদারকে অনুসরন করে বলা যায়, "লোকনাট্যের চরিত্রগুলি দেশের মাটি জল থেকে উদ্ভূত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, 'কুশান' পালার লব-কুশ-সীতা-শত্রুঘ্ন-বাল্মীকি, 'শিবযাত্রা'র শিব-শিবানী, 'বিষহরি' পালার বেহুলা-চাঁদ-মনসা প্রভৃতি লোকবাংলার মাটি-জল সম্ভূত। পুরাণ বা দৈবী সংস্কার এদের আচ্ছন্ন করে নি। আচার-আচরণ, কথা-বার্তায় এ সমস্ত চরিত্র লোকসমাজেরই প্রতিভূ।"[৮] তাই নটুয়ায় রাধাকে বলতে শুনি—

"রাধা ঃ পরের রমণী দেখিয়ে কানু জলে কেনে মর
নিজ জান ভাঙ্গায় কানু বেহা কেনেনি কর।"

রাধা কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষের মতই পরিশ্রম করে পণের টাকা জোগাড় করার উপদেশ দিয়েছেন। আবার কখনও উধব-মাধব প্রাকৃতজনের মত বলে উঠে—

"উধব-মাধব ঃ মামি গরমিত বিচন দিয়া হাওয়া নি করে। তাতে মামাডা রাগ করি পলাইচে।"

অর্থাৎ গরমে রাধা কৃষ্ণকে পাখা দিয়ে বাতাস করেনি বলে কৃষ্ণ রাগ করে পালিয়ে গেছে।

এছাড়া কুশান পালায় বিশ্বামিত্র ও কপিঞ্জনের কথোপকথনে চরিত্রগুলির মানবীকরণ ঘটেছে। যেমন—

"বিশ্বামিত্র ঃ চল্ কপিঞ্জন তপোবনোত দেখিয়া আসি কায় কায় বন্দী হয়া আছে। (পদচারণা) এলা কপিঞ্জন কাংয়োয় তো নাই। কোটে গেইলেক মোর বন্দিনী পঞ্চকইনা। কার এমুন সাহস হৈচে, মোর বন্দিনীলাক মুক্ত করি দিচে।

কপিঞ্জন ঃ সচায় তো গুরু, এমুন কাম কায় করির সাহস পাইল।

বিশ্বামিত্র ঃ কপিঞ্জন, মুই ধ্যান করিয়া দেখং কায় এই বন্দিনী পঞ্চ কইনাক মুক্ত করি দিছে। (ধ্যান) হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র!

কপিঞ্জন ঃ কোন হরিশ্চন্দ্র গুরু?

বিশ্বামিত্র ঃ অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র মোর বন্দিনীলাক মুক্ত করি দিছে। মুই এলায় অযোধ্যা যাইম। রাজা হরিশ্চন্দ্রক পুছিম, কেনে উয়ায় মোর বন্দিনী পঞ্চকইনাক মুক্ত করিছে?

আর শোন মুই যদ্দিন ফিরিয়া না আইসোং তদ্দিন তুই এই তপোবন দেখাশুনা করিস। (প্রস্থান)

কপিঞ্জন ঃ আইসো গুরু। হুঁ হুঁ আজি আমার গুরুর চণ্ডালী দেও খরাইচে। অযোধ্যা যায়া আজি কিবা করে! আর কি করে করুক, ঐ যে কাথায় কয় না- যায় যেমন ঝাল খায় তায় তেমন মজা বোঝে। মুই এলা যাং খায়া দায়া নিন পারং যায়া।"

(কুশান— দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র)

সর্বোপরি চরিত্রগুলির এই রূপান্তর একদিনে সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মনন ও মানসিকতার পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে সময়ের সাথে মানুষ নিজেকে বদলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তারই অনিবার্য প্রভাব পড়ে চলেছে সমাজজীবনে। সমাজজীবনের এই পরিবর্তিত রূপই লোকনাটকে প্রতিফলিত হয়। তাই চরিত্রগুলি কখনও কখনও পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে, আবার কখনও নবরূপ গ্রহণ করছে।

তথ্যসূত্র

১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, পৃ. ৪০।

২. সম্পাদক সন্তোষ চক্রবর্তী, লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৭০।

৩. সম্পাদনা মিহির ভট্টাচার্য, লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

৫. ধনঞ্জয় রায়, খন, পৃ. ২৫।

৬. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৪০।

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ. 132।

৮. সম্পাদক সন্তোষ চক্রবর্তী, লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৩৫।